গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে করণীয়

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক, (১১ জানুয়ারি, ২০০৯)

গত ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮ অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। নবগঠিত সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যান্ডেট হলো রাষ্ট্রে একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন কায়েম করা। এ লক্ষ্যে কী কী করণীয় – দ্রুততার সাথে ও দীর্ঘমেয়াদীভাবে? এ সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণা তুলে ধরাই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে, উল্লেখিত বিষয়গুলোই চুড়ান্ত তালিকা নয় – এ গুলোর সাথে আরো অনেক কিছু যুক্ত হতে হবে।

গণতন্ত্র হলো জনগণের নিজেদের শাসন বা স্ব-শাসন। আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষায়, æ...government of the people, by the people, for the people...” অর্থাৎ গণতন্ত্র হলো জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য। বহুল ব্যবহৃত এবং সর্বজনস্বীকৃত এ সংজ্ঞানুযায়ী, প্রকৃত গণতন্ত্র হলো *সরাসরি* গণতন্ত্র বা ‘ডিরেক্ট ডেমোক্রেসি’। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় – যে সকল সিদ্ধান্ত তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে সে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

কিন্তু লক্ষ-কোটি জনগণ নিয়ে গঠিত আধুনিক রাষ্ট্রে সরকার পরিচালনায় জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। সকল নাগরিকের পক্ষে আইনসভায় আসন গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই উদ্ভব হয়েছে ‘রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি’ বা প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার। এ ব্যবস্থায় জনগণের সম্মতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ না করে সে দায়িত্ব তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর অর্পণ করে। তবে প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে প্রশাসনের সকল স্তরে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যক, যা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। আর এর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথও সুগম হয়। অর্থাৎ গণতন্ত্র আর সুশাসন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়াই যথেষ্ট নয়। এজন্য আরও প্রয়োজন আইনের শাসন, মানবাধিকার সংরক্ষণ, সমাজের সকল স্তরে বিশেষত নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা, সমাজের সকল শ্রেণীর প্রতি ন্যায়পরায়ণতা, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার চর্চা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এগুলোই ছিল মুক্তিযুদ্ধের পেছনের মূল চেতনা ও প্রেরণা।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নির্বাচনই গণতন্ত্র নয় – নির্বাচন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত মাত্র। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যাত্রাপথের সূচনা হয় এবং এর সফলতা নির্ভর করে মূলত নির্বাচিত সরকার কী-করে, না-করে তার ওপর। অর্থ্যাৎ দুই নির্বাচনের মাঝখানে নির্বাচিত সরকারের কার্যক্রম ও আচার-আচরণই নির্ধারণ করে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে কি না।

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নবগঠিত সরকারের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ করণীয় রয়েছে। আরও করণীয় রয়েছে সংসদে যারা বিরোধী দলে রয়েছেন তাদের। সরকারকে অবশ্যই তার নির্বাচনী ওয়াদা এবং অন্যান্য বিষয়ে জনগণের ‘ম্যান্ডেট’ বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে ‘ট্রেজারি বেঞ্চ’ বা সরকারি দল ও বিরোধী দল নিয়েই সরকার। তাই বিরোধী দলের সহায়তা, দায়িত্বশীলতা ও গঠনমূলক সমালোচনা সরকারের সফলতার জন্য অপরিহার্য। গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের ভূমিকাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের দায়িত্ব চাটুকারি ভূমিকার পরিবর্তে সরকারের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে সহায়তা করা এবং সরকার ও সরকার বিরোধীদের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া।

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের করণীয়গুলোকে দু’ভাবে বিভাজন করা যায় – স্বল্প-থেকে-মধ্যমেয়াদি করণীয় ও দীর্ঘমেয়াদি করণীয়। এ বিভাজন দুরূহ এবং অনেকটা মনগড়া, কারণ দীর্ঘমেয়াদি করণীয়গুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনেকক্ষেত্রে উদ্যোগ এখনই নিতে হবে। স্বল্পমেয়াদি বা আশু করণীয় কাজগুলো প্রথম ১০০ দিনের কর্মসূচি হিসেবে অগ্রাধিকার পেতে পারে।

স্বল্প-থেকে-মধ্যমেয়াদী করণীয়

- নির্বাচন প্রাক্কালে দিন বদলের অঙ্গীকার হিসাবে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশ্‌তেহার জাতির সাথে আওয়ামী লীগের একটা অলিখিত চুক্তি, যা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্য জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজন একটি *কর্মপরিকল্পনা* প্রণয়ন। আভ্যন্তরীণ বিষয় ছাড়াও বহির্বিশ্ব সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলো সম্পর্কেও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। কর্মপরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, (যেমন, ১০০ দিন, ছয় মাস, এক বছর ইত্যাদি) টার্গেট ও মাইলস্টোন নির্ধারণ করা। এর ফলে সরকারের পক্ষে এগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে নিবিষ্ট থাকা এবং কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা নিরূপণ করা সম্ভব হবে। এ ধরনের টার্গেট ও মাইনস্টোন নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যানেজমেন্ট টুল বা ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার হতে পারে।
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের অন্যতম আশু করণীয়। এ লক্ষ্যে আইন ও বিধি-বিধানের কঠোর ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সন্ত্রাসী ও আইন-শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে, তারা যে দলেরই হোক না কেন, যথাযথ আইনসম্মত ব্যবস্থা তড়িৎ গতিতে নিতে হবে। এ ব্যাপারে আপন-পর বিবেচনায় কোনোরূপ শিথিলতা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঠেলে দিতে পারে। প্রসঙ্গত, অতীতের ন্যায় প্রত্যাহার করার পরিবর্তে সকল মামলা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হলেও, বিচারিক প্রক্রিয়ায় নিস্পত্তি করা আবশ্যক।
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সরকারের ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। এ সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান অধিক উৎপাদন, সরবরাহ বৃদ্ধি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা উৎসাহিতকরণ। এ লক্ষ্যে আশু করণীয় হতে পারে বাজার পরিস্থিতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং সাধারণ মানুষের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীর, প্রয়োজনে আমদানীর মাধ্যমে, সরবরাহ বৃদ্ধি করা। ভবিষ্যতে অবশ্য টিসিবি’র (ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) মত প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করতে হবে।

- যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যান্ডেট। তাই এ কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য জাতিসংঘের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে বলে অনেকে মনে করেন। আরও প্রয়োজন হবে যথাযথ তথ্য ও উপাত্ত একত্রীকরণ। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পদক্ষেপ দ্রুততার সাথে গ্রহণ করতে হবে।
- আওয়ামী লীগ দুর্নীতি দমন কার্যক্রমকে চলমান রাখার অঙ্গীকার জনগণকে দিয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের মন্ত্রীসভা থেকে দূরে রেখে এ অঙ্গীকারের প্রতি সরকার তার আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছে। সরকারের অনমনীয়তা প্রদর্শনের জন্য এখন যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা আছে কিংবা যাদের সম্পর্কে দুর্নীতির প্রমাণ আছে তাদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে হবে। আরও নিশ্চিত করতে হবে, কোনোভাবেই যেন দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের 'রাজনীতিকরণ' না হয়। একইসাথে দুর্নীতির কারণ নিরূপণ করে তা দূরীভূতকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়াও ঘুষের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা (যেমন, ফাইল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে) গ্রহণ করতে হবে। ঘুষ-দুর্নীতি দমন কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে প্রতি মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় ন্যায়পাল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে হলে সংসদকে কার্যকর করার কোন বিকল্প নেই। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া হলেও এ সম্পর্কে কিছু আশু করণীয় রয়েছে। আমরা আনন্দিত যে, সরকার বিরোধী দলকে ডিপুটি স্পিকার পদ প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে। আমরা আশা করি যে, বিরোধী দলের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে যথাযথ ব্যক্তিকে এ দায়িত্ব প্রদান করা হবে। সংসদের দায়িত্ব হলো বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে *বিতর্ক অনুষ্ঠান, আইন প্রণয়ন* ও পার্লামেন্টে স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে *সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা* নিশ্চিতকরণ। সংসদে গঠনমূলক বিতর্ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্পিকারের ভূমিকা, বিশেষত তার নিরপেক্ষতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই একজন প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তিকে স্পিকারের ও ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্ব দিতে হবে এবং তাদের দল থেকে পদত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় হবে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের নিবিষ্ট রাখার লক্ষ্যে সংসদ পদকে একটি সার্বক্ষণিক কার্যক্রমে পরিণত করতে হবে এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে যথাযথ সাচিবিক ও বিশেষজ্ঞ সহযোগিতাও দিতে হবে। পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো দ্রুততার সাথে গঠন করতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ কমিটির, বিশেষত 'পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি'র সভাপতির পদ বিরোধী দলের একজন সদস্যকে দিতে হবে। একইসাথে মাননীয় সংসদ সদস্যদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন এবং একটি পার্লামেন্টারী 'এথিকস্ কমিটি' গঠনের মাধ্যমে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আচরণবিধির অংশ হিসেবে প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে বিস্তারিত সম্পদ ও দায়-দেনার হিসাব প্রকাশ এবং প্রতি বছর এগুলো আপডেট করতে হবে। মন্ত্রীপরিষদের অন্যান্য সদস্যদের জন্য একই বিধান করতে হবে।
- 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার শ্লোগানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এ খাতের বিস্তারের মাধ্যমে আমাদের তরুণদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। একইসাথে তথ্যপ্রযুক্তি হতে পারে সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জনকল্যাণে জারি করা সবগুলো অধ্যাদেশকে সংসদের প্রথম অধিবেশনেই প্রাথমিকভাবে অনুমোদনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তবে পরবর্তীকালে এগুলোকে যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- একটি শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী সচিবালয় আমাদের অতীতের প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিরই উত্তরাধিকার। প্রকৃত সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী 'ফাস্ট এমাং দি ইকুয়েল' বা সম'দের মধ্যে প্রথম। এ পদ্ধতিতে একটি শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থাকার যৌক্তিকতা নেই এবং এর ফলে 'ইম্পেরিয়াল প্রিমিয়ারশীপ' বা প্রধানমন্ত্রীসর্বস্ব একটি ব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থেকে যায়। তাই বর্তমানের পরাক্রমশালী প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়কে ছোট করা সরকারের একটি অন্যতম অগ্রাধিকার হওয়া আবশ্যক বলে আমরা মনে করি।
- রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের ইঞ্জিন বা চালিকাশক্তি। গণতান্ত্রিক, আর্থিকভাবে স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল ছাড়াও গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। তাই রাজনৈতিক দলের সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এবং এজন্য একটি ভিন্ন আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক। তবে *গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধিত) অধ্যাদেশ*, ১৯৭২-এ [ধারা ৯০ (খ)] রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত হিসাবে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধান যুক্ত করা হয়েছে। যেমন, নির্বাচনের মাধ্যমে দলের সকল পর্যায়ের কমিটি গঠন, কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব, দলের অঙ্গ-সংগঠনগুলোর বিলুপ্তি, ইত্যাদি। এসকল আইনি-বিধান উপেক্ষা করলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিরাজমান লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি বন্ধ না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি-শৃঙ্খলা ও শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে না।
- শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর "স্থানীয় শাসনের" ভার প্রদান – যাতে তারা স্থানীয় সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান করতে পারে – আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন দ্রুততার সাথে সম্পূর্ণ করতে হবে। এ সকল নির্বাচনকে নির্দলীয় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সম্পদ, ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন ও গণতন্ত্রকে গভীরতা প্রদান করতে হলে এর কোন বিকল্প নেই। তাই স্থানীয় সরকার কমিশনের পরামর্শক্রমে এ লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়ার কথা এখনই ভাবতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ আইনে প্রস্তাবিত 'ওয়ার্ড সভা' হতে পারে একটি 'সিটিজেনস্ পার্লামেন্ট' বা জনগণের আইনসভা।
- সরকারি মালিকানাধীন গণমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার কার্যকর প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।
- বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশের সাধারণ মানুষ স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েছে, কিন্তু তারা সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদের আলোকে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস বা মালিকে পরিণত হতে পারে নি। এর একটি বড় কারণ আমাদের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর নিরক্ষতা এবং অসচেতনতা। বাঙালি জাতি মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিলেও আমাদের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী বাঙলা ভাষা পড়তে ও লিখতে পারে না, যা আমাদের জন্য দারুণ লজ্জার বিষয়। এ লজ্জাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে একটি সাক্ষরতা আন্দোলন শুরু করতে হবে, যাতে প্রত্যেকটি নাগরিক অন্তত খবরের কাগজ পড়তে পারে। (তরুণদের জন্য কম্পিউটার লিটারেসিও এ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।) এ কাজটি ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে এ কাজটি ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হয়েছে। এ ধরনের একটি উদ্যোগের ঘোষণা ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখেই হতে পারে।

- আমাদের মূল সংবিধান যে প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে তা বহুলাংশে বদলে গিয়েছে। এছাড়াও সংবিধানকে আরও অনেকবার পরবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই একটি 'সংবিধান পর্যালোচনা কমিটি' গঠন করা জরুরি বলে আমরা মনে করি। এ ধরনের একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন/বিলোপ, সংসদের একটি উচ্চ কক্ষ স্থাপন, নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভবিষ্যত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিতর্ক শুরু হতে পারে।
- নারী উন্নয়ননীতির বাস্তবায়নও দ্রুততার সাথে করা প্রয়োজন। নারীর প্রাপ্য অধিকার ও তাদের সত্যিকারের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গৃহীত 'নারী উন্নয়ন নীতি' অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নারীর প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনা দূরীভূত এবং তাদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা না গেলে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না।
- জনসংখ্যা রপ্তানী আমাদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে জনসংখ্যা রপ্তানির আগে তাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একইসাথে দেশে-বিদেশে তাদেরকে প্রতারণা কঠোরভাবে দমন করতে হবে।
- আমাদের সম্পদ সীমিত এবং এ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য সরকারকে জরুরিভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে দক্ষ ব্যবস্থাপনার ওপর। এলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে পেশাদারীত্বের মনোভাব গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এ ছাড়াও সরকার পরিচালনায় কৃচ্ছতা প্রদর্শন করতে হবে। একইসাথে সরকারি কর্মকর্তাদের কর্ম উদ্যোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদী করণীয়

সরকারকে সফল হতে হলে আরও অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিতে হবে, যেগুলো সম্পূর্ণ করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে।

- একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে দারিদ্র্য ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের অবসান জরুরি, যা নিঃসন্দেহে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। তবে এজন্য আমাদের বর্তমান উন্নয়ন কৌশলের পরিবর্তন আবশ্যক। প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে অতীতে দারিদ্র্য দূরীভূত হয় নি এবং ভবিষ্যতে তা হবেও না, কারণ প্রবৃদ্ধি কখনও দারিদ্র্যবান্ধব হয় না। এছাড়াও 'সেফ্‌টি নেট' প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভিক্ষা-অনুদান দিয়েও দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। এজন্য প্রয়োজন হবে দরিদ্রদেরকে ক্ষমতায়িত করা, তাদের সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া। এ লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান ধনী-দরিদ্রের ও গ্রাম-শহরের বৈষম্যের অবসান ঘটানোও গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি, সত্যিকারার্থে দারিদ্র্য দূর করতে হলে আমাদেরকে গতানুগতিক বাক্সবন্দী চিন্তার বাইরে আসতে হবে। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে শিল্পকারখানা স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, রপ্তানী বহুমূখীকরণ, দক্ষ জনবল সৃষ্টি ইত্যাদির ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। 'পিআরএসপি' ভিত্তিক দারিদ্র দূরীকরণ প্রচেষ্টার বাইরে এসে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রনয়ণের কথা ভাবতে হবে। বিদেশী সাহায্য গ্রহণের বিষয়ে আরো বেশী সুবিবেচনা প্রদর্শন করতে হবে।
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষির ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। কৃষকের আয়-বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বাড়বে এবং এগুলোর উৎপাদন উৎসাহিত হবে। ভূমি সংস্কারের বিষয়টিকে ও অগ্রাধিকারে আনতে হবে। একইসাথে ভূমি ব্যবহারের একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- উগ্রবাদের বিস্তার রোধ করাও সরকারের একটি দীর্ঘমেয়াদী অগ্রাধিকার হওয়া আবশ্যক। ধর্মের নামে সহিংসতায় লিপ্ত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে উগ্রবাদ বিস্তারের নেপথ্যের কারণ চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান করতে হবে। আমরা মনে করি যে, সমাজে বিরাজমান ব্যাপক দারিদ্র্য ও বৈষম্য এবং সুশাসনের অভাব উগ্রবাদের বিস্তারের একটি বড় কারণ।
- জনসংখ্যা রোধের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। জনসংখ্যা একটি সম্পদ, যদি তা অপরিকল্পিত না হয়। ক্ষুদ্র ভৌগোলিক এলাকার কারণে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আমাদের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই পরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ওপর আমাদের অগ্রাধিকার দেয়া জরুরি। এ ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদের মত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- দলীয়করণ ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির কারণে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। প্রশাসনে মেধাশূন্যতা আজ একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই প্রশাসনিক সংস্কারের উপর জরুরি ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সরকারের আকার ছোট করতে হবে।
- গ্রামীন ও শহুরে শিক্ষার মানে বৈষম্য এবং বহুমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের ওপর নজর দিতে হবে। একইভাবে নজর দিতে হবে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের প্রতি।
- আরও অনেকগুলো দীর্ঘমেয়াদী সংস্কার কর্মসূচিতে সরকারের হাত দেয়া জরুরি। যেমন, পুলিশ সংস্কার, বিকেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক দলের সংস্কার, বিচার বিভাগের সংস্কার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কার, পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে উদ্যোগ, জলবায়ুর উষ্ণতার কারণে সৃষ্ট ঝুঁকিরোধ, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন, জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কার, নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ, পানি চুক্তির বাস্তবায়নসহ প্রতিবেশিদের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সকল সমস্যার সমাধান ইত্যাদি।

বিরত থাকা জরুরি

স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী অনেকগুলো কর্মসূচি হাতে নেয়া ছাড়াও সরকারকে এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যদেরকে কতগুলো কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, যেগুলো হলো:

- মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও দলীয় নেতৃবৃন্দের তদবীর ও তদবীরের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত সুযোগ-সুবিধা প্রদান থেকে বিরত থাকা জরুরি। অতীতের ন্যায় কোনভাবেই সরকারের বাইরের কিংবা ভেতরের স্বার্থান্বেষী কেউ যেন পার্সেন্টেজের বিনিময়ে কোন ধরনের সরকারি কন্ট্রাক্ট বা অনুকম্পা বিতরণের সুযোগ না পায়।
- সরকার কোন দলের নয়. সরকার সকল নাগরিকের। তাই দলীয় আনুগত্যের বা এলাকাপ্রীতির কারণে কারো প্রতি যেন কোনরূপ পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ না করা হয়।
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে কোন এলাকার প্রতি যেন পক্ষপাতমূলক অগ্রাধিকার না দেয়া হয়। এ সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকার প্রতি অবশ্য বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।
- অতীতের ন্যায় সরকারের বাইরে ক্ষমতার বিকল্প কেন্দ্র যেন সৃষ্টি না হয়। মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের পরিবার পরিজনদের সংযত আচরণ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের বাড়াবাড়ি কঠোরভাবে রোধ করতে হবে।
- প্রশাসনকে দলীয়করণ ও কাউকে অনাকাঙ্ক্ষিত ফায়দা প্রদান না করা হয়। কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও বদলির সিদ্ধান্ত থেকে মাননীয় সংসদ সদস্যদের দূরে রাখতে হবে। নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতাই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হওয়া আবশ্যক। 'নিয়োগ বাণিজ্য' কঠোরভাবে দমন করতে হবে।
- সরকারকে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন ও প্রতিহিংসামূলক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হবে। সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা প্রদর্শন করতে হবে এবং চাটুকারদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, সমালোচকদের পরিবর্তে চাটুকাররাই সরকারের সত্যিকারের ক্ষতি সাধন করে। সর্বোপরি, নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি সৃষ্টির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে।
- মাননীয় সংসদ সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়ন কাজে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, মাননীয় সংসদ সদস্যদেরকে শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে – এ থেকে ব্যত্যয় ঘটলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। একইসাথে ভারতের ন্যায় 'এমপিএলএডি' স্কীম (Members of Parliament Local Area Development Scheme) প্রবর্তন থেকে বিরত থাকতে হবে। ভারতীয় পার্লামেন্টের পাবলিক একাউন্টস কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান জনাব এরা সেজিয়্যান-এর মতে, এই স্কীমের অধীনে দুর্নীতি ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী সকল দুর্নীতিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভারতের 'কন্সটিটিউশনাল রিভিউ কমিটি' এটি বিলুপ্তির সুপারিশ করেছে এবং এ লক্ষ্যে সেদেশে একটি আন্দোলনও গড়ে উঠেছে।
- মাননীয় সংসদ সদস্যদেরকে ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি প্রদান ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবাসিক এলাকায় প্লটসহ অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান বন্ধ করতে হবে।
- মাননীয় সংসদ সদস্যদের সরকারের সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে লিপ্ত হওয়া এবং নিজ পদমর্যাদা ব্যবহার করে ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধাগ্রহণ কঠোরভাবে রোধ করতে হবে।
- বিচার বহির্ভুত সকল হত্যা অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
- মন্ত্রীত্ব যেন কারো ক্ষেত্রেই আগামী পাঁচ বছরের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা না হয় সেদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মাঝে মাঝে রদবদলের মাধ্যমে মন্ত্রী সভায় নতুন নেতৃত্ব অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং অসফলদের বাদ দিতে হবে। মন্ত্রীসভা থেকে বাদ পড়া সততার সুনাম আছে এমন ব্যক্তিদেরকে পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর নেতৃত্ব প্রদান করে সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা আরো কার্যকর করা যেতে পারে।
- অতীতের ন্যায় নীতি-নির্ধারকদের কথায় কথায় ক্যামেরার সামনে আসার প্রবণতাকে রোধ করতে হবে। অর্থাৎ কম কথা বলে বেশি কাজ করতে হবে। তাদেরকে বেশী শুনতে হবে। মন্ত্রীদের দ্বারা সবকিছু উদ্বোধন করার সংস্কৃতির অবসান ঘটাতে হবে।
- আমাদের সীমিত সম্পদের সাধারণ নেতা-নেত্রী, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের জীবনযাত্রা প্রণালী যেন সংযত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এদেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী ব্যাপক দরিদ্র্যতার মধ্যে জীবন-যাপন করছে এবং তাদের অবস্থা অনেকক্ষেত্রে নুন আনতে পান্তা ফুরায়।

আমাদের সরকার ব্যবস্থাপনায় অতীতে তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি, উন্নয়ন কৌশল, বিনিয়োগ নীতি ইত্যাদিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি, যদিও সমাজে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি-দুর্বত্তায়নের বিস্তার ঘটেছে। বস্তুত, মনে হয় যে, অতীতে আমাদের সরকার পরিচালিত হচ্ছিল অনেকটা 'অটোমেটিক পাইলটে'। দিনবদলের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই তাই আজ মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে – অনেক কিছুকেই নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। আশাকরি যে, নবনির্বাচিত ও নিরঙ্কুশ বিজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত সরকার সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাহসিকতা ও দূরদর্শিতা প্রদর্শন করবে।